79

তারিখ 09 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

দৈনিক সংবাদ

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে প্রয়োজন অভিভাবকদের সচেতনতা

এ এন রাশেদা

এই অসম্ভবের দেশে সবই সম্ভব। ফেব্রুয়ারি মাস গত হতে চললেও অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষের ২টি মাস— কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রমের দেখা নেই স্কুলে। ২৪শে আগস্ট '৯৫ একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ২৪৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে কারিকুলাম প্রকল্পের কাহিনী। সেখানে সন্দেহ করে বলা হয়েছিল— জানুয়ারি থেকে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রমের বই চালু করা অনিশ্চিত। যা হোক এ প্রবন্ধে সে অন্য প্রসঙ্গ। তবে টাকার অংকটি একটি প্রসঙ্গ বটে। দেশবাসীর অবশ্যই জানার অধিকার আছে যে এত কোটি টাকা যেখানে ব্যয় হচ্ছে, সেখানে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি পাচ্ছে বা তাদের আমরা কিভাবে পেতে চাই অর্থাৎ গড়ে তুলতে চাই। এই বিশাল অংকে সবটাই কারিকুলামের জন্য ব্যয় হয়নি বলে কারিকুলাম বোর্ডের জনৈক কর্মকর্তা আলাপ প্রসঙ্গে দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'অন্যান্য কাজে'। কী কাজ তা তিনি বলেননি। তার ইঙ্গিতে ধরে নেয়া যেতে পারে হয়ত বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিদেশ ভ্রমণসহ অন্যকিছু।

নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই তো। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে নতুন কারিকুলামের জন্য এত অর্থ ব্যয় যেখানে হলো, সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণও হলো— তাহলে কারিকুলামটি কি? কারিকুলাম সম্ভবত দু'একটি স্কুলে দেখা দিয়েছে কিন্তু অন্যসব স্কুল না পাওয়ার ফলে বই-এর তালিকাও নাকি দিতে পারছে না। যে দু'একটি স্কুল এনেছে বা জেনেছে তারা শিক্ষার্থীদের তা জানিয়ে দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী রুটিনও করেছে। সেই তথ্যে জানা গেল বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষাক্রম দেয়া হয়েছে তাতে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা কোনভাবে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ অর্থাৎ পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিত— এই চারটি বিষয় একই সঙ্গে নিতে পারবে না। নিতে হবে যেকোন তিনটি। অর্থাৎ তাকে নবম শ্রেণীতেই প্রি-মেডিক্যাল বা প্রি-ইঞ্জিনিয়ারিং এভাবে হয়ত বিভাজনের নিরর্থক চিন্তা কর্তৃপক্ষ করেছেন, যদিও এ চিন্তা বর্তমান অগ্রগতির যুগে একেবারেই অবাস্তব। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের সমন্বিত বিষয়সমূহ নিয়ে পড়তে পারবে না অথচ তাদের আবশ্যিক হিসেবে পড়তে হবে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতের এই ৫০০ নম্বর ছাড়া ধর্ম শিক্ষা, কৃষি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান। অর্থাৎ ৮০০ নম্বরই তাদের আবশ্যিক হিসেবে নিতে হবে। পাঠক লক্ষ্য করুন— বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা কিন্তু পূর্বের ১০০০ নম্বরের মধ্যে বিজ্ঞানের ঐ যেকোন ৩টি বিষয়ও নিতে পারছে না। তাদের 'অতিরিক্ত বিষয়' হিসেবে যেকোন একটিকে নিতে হবে অর্থাৎ হয়ে গেল ১১০০ নম্বর। কথা হলো বিজ্ঞানের সমন্বিত জ্ঞানের জন্য যে বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরি তা বাদ দিয়ে ধর্ম শিক্ষা, কৃষি বিজ্ঞান/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান— এগুলোকে আবশ্যকীয় বিষয় করা কেন জরুরি হয়ে পড়ল? এতই যখন প্রয়োজন তখন ঐগুলো বরং ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা যেতে পারত। কারণ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তারা ধর্ম শিক্ষা পড়ে আসে, সমাজ বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞানও। কাজেই মাধ্যমিক পর্যায়ে এগুলোকে আবশ্যিক করা একেবারেই অনাবশ্যক নয় কি?

১৯৯৫ সালেই যারা মাধ্যমিক পাস করল তাদের শিক্ষাক্রমেও বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড নামে পদার্থ ও রসায়ন এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান সবই আবশ্যিকের মতই ছিল। একইভাবে ভূগোলও ছিল। অথচ ১৯৯৮ সালেই পরীক্ষার্থীদের জন্য ভূগোল একেবারেই অনাবশ্যক হয়ে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে ৯৮ সালে বিজ্ঞান শাখায় যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য এমনকি বিজ্ঞানের সমন্বিত বিষয়গুলোও অনাবশ্যক হয়ে গেল। কাদের জন্য কোন্ বিষয়গুলো আবশ্যক সেই জ্ঞান যদি কারিকুলাম প্রণেতাদের না থাকে তাহলে শুধু শুধু পদে থেকে শিক্ষার্থীদের হয়রানি করা এবং দেশের সর্বনাশ ডেকে আনা কেন?

তারা বলবেন— সব সিদ্ধান্ত সভা করেই তো করা হয়। এখানেও প্রশ্ন— সভায় সকলের মতামত নিয়েই যদি করা হয় তাহলে এত ঘন ঘন কারিকুলাম পরিবর্তন করা হচ্ছে কেন? ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে পারে সিলেবাস। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলাতে বা নব নব উদ্ভাবনের সাথে পরিচিত করতে সিলেবাস আধুনিক করা যেতে পারে বছর বছর। কেউ যদি বলেন কারিকুলাম বদলের খেলা হলো বিদেশী ঋণের অর্থ লুটেপুটে আত্মসাতের জন্য তাহলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি জবাব দেবেন? তারা জানেন দেশে জবাবদিহিতা নেই। তারা জানেন এদেশে হত্যার বিচার নেই, অপকর্মের শাস্তি নেই। তাই আজকাল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে প্রকল্পের অভাব নেই। শুধু অভাব পরিকল্পিত জ্ঞানের। ওপর থেকে যা বলে দেয়া হয়— যুক্তি দিয়ে তাকে বিচার না করে 'জি হুজুর' করাটাই যেন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দায়িত্ব এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাদের নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরও ঐ আদেশ পালনে বাধ্য করান। কেউ যদি তার মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে তাকে নিরর্থক ওয়াকআউট করতে হবে— পারিশ্রমিকও মাটি। তাই প্রায় সবাই 'জি হুজুর' বলে দায়মুক্ত হতে চান। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মই নয়-ধ্বংস হবে দেশ, হারাবে তার মেধা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যুগে যে স্তরে সমন্বিত জ্ঞানের প্রয়োজন সে স্তরে তা দিতে না পারার জন্য শিক্ষার্থীরা হবে পঙ্গু। মাধ্যমিক পর্যায়ে জীববিজ্ঞান বা উচ্চতর গণিতের অনুপস্থিতি শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষায় দারুণভাবে বিপাকে ফেলবে। বর্তমানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিভিন্ন স্নাতক কোর্সে অংক ও জীববিজ্ঞান এক সাথে না থাকলে শিক্ষার্থী আবেদনের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। এছাড়া উচ্চতর গণিত ছাড়া উচ্চতর শিক্ষার কল্পনাই করা যায় না। আধুনিক কম্পিউটারাইজড চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া উচ্চতর গণিত ব্যতীত আধুনিক জগতে সম্ভব নয়। তাহলে বাংলাদেশ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলো কি ভবিষ্যতে কবিরাজ বা হাতুড়ে ডাক্তার বানানোর কারখানায় পরিণত হবে? এছাড়াও অর্থনীতি ব্যবসা প্রশাসনসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের নিরিখে উচ্চতর গণিত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বায়োলজিক্যাল সায়েন্স উন্নত হয়েছে বিজ্ঞানের সকল শাখায় উন্নয়নের ধারায়। উদাহরণস্বরূপ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংসহ আরও নানা বিষয়ের কথা স্মরণ করা যায়। আবার অপরপক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শাখাতেও যুক্ত হচ্ছে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ বিজ্ঞান— এখানেও উচ্চতর গণিতের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হয়ে পড়বে বায়োলজিজ্ঞান।

এছাড়াও কথা আছে, আগে শিক্ষাক্রমের কাঠামো ছিল একটি। নৈর্বচনিক বিষয় বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ও মানবিক এ দু'টি ধারায় বিভক্ত হতো। বিজ্ঞানের ধারায় যারা উচ্চতর গণিতে কম মেধাবী তাদেরকে বুক কিপিং নিতে অনেক স্কুল সাহায্য করত বা অনেকে নিত। অথচ '৯৮ সালের শিক্ষাক্রমের কাঠামোতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষা এভাবে একেবারেই ভিন্ন করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে গার্হস্থ্য শাখা, কৃষি বিজ্ঞান শাখা ও ইসলামী শিক্ষা শাখাও স্কুলেই প্রবর্তন করা হবে। অথচ দেশে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। এতদিন এইসব শাখায় ভর্তির ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে অত্যন্ত সুচতুরভাবে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বোপরি দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার এক সুগভীর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কাজ করছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কেউ বুঝেও চেয়ার রক্ষা বা কেউ ভিন্ন স্বার্থে কথা বলছেন না আর কেউ সরল মনে বুঝতেই পারছেন না। কেননা তারা শ্লোগান হিসেবে এক কথায় বলেন "আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা।" আবার বলেন— শিক্ষার্থীকে জ্ঞান আহরণে উদ্দীপ্ত করা, শিক্ষার্থীকে ধর্মীয়, নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা ও কর্মসূচি বিষয়ক শিক্ষাদান ইত্যাদি। এসব কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভ্রান্তির অবকাশও আছে।

তবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করার পরিকল্পনা যে নেই তা তাদের কার্যক্রমে পরিষ্কার। বিজ্ঞানমনস্ক করা আরও পরের কথা। তাই আজ প্রয়োজন সচেতন অভিভাবকদেরই আরও সচেতন ও সংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসার এবং দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ করার।